সম্ভাবনার অগ্রযাত্রায় নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ

ইমদাদ ইসলাম

একজন নারীর জন্ম থেকেই জীবনযুদ্ধ শুরু হয়। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নারীদের জীবন পার করতে হয়। বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে শিক্ষাজীবন, সংসার জীবন এমনকি কর্মক্ষেত্রেও নানা বাধা মোকাবেলা করতে হয় নারীদের। নারীর অগ্রগতির পথে দেশ অনেক দূর এগিয়েছে। নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বর্তমানে অনেক বেড়েছে। বর্তমানে গ্রামে ও শহরে নারীদের অবস্থানে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। অতীতে নারীদের কাজের সুযোগ খুব সীমিত ছিল। মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ নারী হলেও বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণের হার এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায় নি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বর্তমানে নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ৪২ দশমিক ৭০ শতাংশ, যেখানে পুরুষের অংশগ্রহণ ৮০ শতাংশের কাছাকাছি। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নারীর অংশগ্রহণে কিছুটা অগ্রগতি ঘটলেও তা স্থিতিশীল নয় এবং কাঠামোগত কিছু সীমাবদ্ধতা এ অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। দেশের বৃহৎ একটি অংশের নারী শ্রমিক এখনো কৃষি খাতে নিয়োজিত। তবে এ খাতের বড় একটি অংশই অনানুষ্ঠানিক এবং অনেক ক্ষেত্রে অবৈতনিক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু সেটি কখনো অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। বলা হতো, এগুলো গৃহস্থালির কাজ। মূলধারার শ্রমবাজারের পাশাপাশি গৃহস্থালি শ্রম অর্থনৈতিকভাবে স্বীকৃতি না পাওয়ায় তা জাতীয় উৎপাদনে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। বর্তমানে এ চিত্র বদলেছে। নারী খেতমজুর হিসেবে কাজ করছেন। মাটি কাটার কাজও করছেন। আবার কৃষিকাজ কিংবা গার্মেন্টসেও চাকরি করছেন। ছোট ছোট শহরেও নারীর আয়ের নানা সুযোগ তৈরি হয়েছে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যেও এগিয়েছে। পাশাপাশি নারী শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এখন অনেক মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে, যা আগে কল্পনাও করা যেত না।

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও মেয়েরা এখন পড়াশোনা করছে। কারিগরি শিক্ষায়ও মেয়েরা এগিয়ে আসছে। তারপরও শিল্প ও সেবা খাতে বিশেষ করে উৎপাদন, তথ্যপ্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবার মতো ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এখনো কম। অথচ এসব খাতেই অধিক দক্ষতা, উচ্চ মজুরি ও পেশাগত বিকাশের সুযোগ রয়েছে। এ খাতে নারীদের প্রবেশে দক্ষতার ঘাটতি, প্রশিক্ষণের অভাব, সামাজিক কাঠামো জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশের অভাব এবং প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের দিক থেকে নারীদের জন্য আরো বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রয়োজন। বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি,প্রকৌশল ও গণিত (STEM) ভিত্তিক শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো দরকার। উচ্চ শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, আবাসন, নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়াতে হবে। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নয়, শ্রমবাজার উপযোগী কারিগরি ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কেবল নারী উন্নয়ন নয়, বরং দেশের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা, মাথাপিছু আয় ও দারিদ্র্য হ্রাসের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে, নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বাড়লে একটি দেশের জিডিপি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে । বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটও এর ব্যতিক্রম নয়। শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও এর গুণগত পরিবর্তন কোনো একক খাত বা নীতি সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়। এটি একটি সমন্বিত রূপান্তর প্রক্রিয়া, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, দক্ষতা, ন্যায্য মজুরি, কর্মস্থলের নিরাপত্তা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির ইতিবাচক পরিবর্তন। রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি খাতের যৌথ প্রয়াসেই এ রূপান্তর হচ্ছে। তবে এটা ঠিক তা এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। তবে অগ্রগতি সত্ত্বেও নানা ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য রয়ে গেছে। এখনো খেতমজুর হিসেবে একজন পুরুষ এক হাজার টাকা মজুরি পেলে সেই একই কাজ করে একজন নারী পান মাত্র ছয়শত টাকা। মৌসুমভেদে মজুরি কিছুটা বাড়লেও অফ সিজনে সেই আয় অর্ধেকে নেমে আসে। এখানে এখনও বৈষম্য অনেক বেশি।

বাংলাদেশে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে নারীদের ভূমিকা ব্যাপক। তবে এই ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে নারীদের দেখা হয় ভিন্ন চোখে। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের অনেক সেক্টরই ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে নারীদের অংশগ্রহণ পজেটিভ চোখে দেখছে না। তবুও পিছিয়ে নেই নারীরা । প্রতিদিন নারী উদ্যোক্তারা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে নানা সফলতা বয়ে আনছেন,যা গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি।ইতোমধ্যে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের চাহিদা বাড়ছে। আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীরা অনলাইন মাধ্যমে কাজ করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে । পাশাপাশি অনলাইনে বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করেও হচ্ছে স্বাবলম্বী । নারীদের সবসময়ই ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করতে হয়। বিভিন্ন সেক্টর থেকে নারীদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। নারীদের সফলতার জন্য নানা রকম নারীবিদ্বেষী নিয়মকানুনের মোকাবেলা করতে হয়।

নারীদের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন এসেছে। আগে নারীদের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। মাতৃমৃত্যুর হার বেশি ছিল। বর্তমানে তা অনেক কমেছে। নারীদের গড় আয়ু বেড়েছে। একসময় বাংলাদেশে নারীদের আয়ু পুরুষের তুলনায় কম ছিল। এর কারণ ছিল অপুষ্টি, চিকিৎসার অভাব, কিশোরী বয়সে সন্তান জন্মদান ইত্যাদি। এ পরিস্থিতিও বদলেছে। বাংলাদেশে নারীর গড় আয়ু উন্নত দেশের সমান অবস্থানে পৌঁছেছে।সমাজে এখন অনেকেই মনে করে বাল্যবিবাহ উচিত নয়। কিন্তু আবার অনেকে বলেন, ‘আমার মেয়েকে রক্ষা করতে হলে বিয়ে দিতে হবে । চলমান সময়ে বাল্যবিবাহ মানে অতীতের মতো নয়-দশ বছরে বিয়ে নয়। আরেকটি বড় পরিবর্তন এসেছে কন্যাশিশুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে। একসময় কন্যাশিশুর জন্মকে নেতিবাচকভাবে দেখা হতো। পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল ছিল যে প্রকাশ্যে বলা হতো, ‘কন্যা আমাদের দরকার নেই।’ বর্তমানে পরিস্থিতি

পুরোপুরি না বদলালেও অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এখন কন্যাশিশুর প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। অতীতের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই সরে গেছে।

সমাজে 'নারীর নিরাপত্তাহীনতা' একটি বড় সমস্যা । গৃহশ্রমিকরা নির্যাতনের শিকার হন মালিকের বাড়িতে। সেখানে সে একা থাকে। তাই সে নির্যাতনের প্রতিবাদও করতে পারে না। আর মামলা হলে তার পক্ষে সে নিজে ছাড়া আর কোনো সাক্ষীও থাকে না। ফলে এখানে নির্যাতন বেশি। যেমন পোশাককর্মীরা একসঙ্গে কাজ করে। তাই তারা প্রতিবাদ করতে পারে । শারীরিক, সামাজিক, মানসিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রেই নারীরা ঝুঁকিতে থাকে। নারী নির্যাতনের যত মামলা থানায় হয় বা ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পায়, প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। কারণ অনেক নারী থানায় যেতে পারে না। আবার দেখা যায়, ভুক্তভোগী নারী মামলা করতে চাইলে বা আদালতে গেলে তাকে নারীবিদ্বেষী মনোভাবের শিকার হতে হয়। সমাজও তাদের দিকে সন্দেহের চোখে দেখে । গ্রামীণ সালিশে এখনো মানসিকতায় পরিবর্তন আসেনি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এখনো টিকে আছে। ফলে নারী অনেক ক্ষেত্রেই তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতার একটি কারণ হলো তাদের গুরুত্বপূর্ণ বা সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য হিসেবে না দেখা। পরিবারের ও সমাজের মধ্যে নারীদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা এখনো স্বীকৃত নয়, বরং প্রায়ই তা উপেক্ষিত থাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রকে নারীবান্ধব করে তোলা, যাতে নারীরা ভয়মুক্ত জীবনযাপন করতে পারে ।এজন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর অবদান তুলে ধরে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালু করতে হবে । নারী বিদ্বেষী সামাজিক প্রথা ও বৈষম্যমূলক সকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

নারীর ওপর অত্যাচার, বৈষম্য, ধর্ষণ, নারীকে কোণঠাসা করে রাখার প্রচেষ্টা বৃহত্তর নারী সমাজকে পিছিয়ে দিচ্ছে। নারীদের চাহিদা, তাদের প্রয়োজন, তাদের দাবিগুলো উপেক্ষা করে দেশের উন্নতি সম্ভব না। নারীর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়তে হবে। ইতিবাচক মনোভাব প্রথমে পরিবারের মধ্যে আনতে হবে। নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ করতে হবে। নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। আর পরিবর্তনের দায়িত্ব সবাইকেই সবাইকে নিতে হবে।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার